সুবোধ ঘোষের গল্প : আলো-আঁধারের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছুরণ

বর্ষা বিশ্বাস

কল্লোলের গল্পে যৌবনের স্বপ্ন-যন্ত্রণা-বিদ্রোহ; আর প্রবাসী-ভারতবর্ষ-বিচিত্রা ও শনিবারের চিঠি গোষ্ঠীর বিজ্ঞান দৃষ্টি ও জীবনাবেগের স্ফূর্তি অতিক্রম করে—বাংলা ছোটগল্পে বাস্তবতা, কূটৈষণা ও জটিলতা নিয়ে এলেন জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষ। তিনজনেই তাৎক্ষণিক থেকে চিরায়ত সমস্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষর অন্তরালে জটিলতার আবিষ্কারেও তার স্বরূপ অনুসন্ধানে উদগ্রীব। তবু তাদের মধ্যে সর্বাংশে মিল নেই। জগদীশ যতটা নৈরাশ্যবাদী, মানিক ততটা নন। আবার মানিক যতটা তিক্ত সুবোধ ততটা নন। মানিক-সুবোধ দুজনেই, গল্পের সামাজিক পটভূমি ও অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন; শ্রেণী চরিত্রে ওয়াকিবহাল; দুজনেই মার্কস, ফ্রয়েড পড়েছেন। জীবনের সম্পর্কগুলো যে, স্বার্থচালিত, হৃদয়াবেগ নিয়ন্ত্রিত নয়; এবিষয়ে মতপার্থক্য না থাকলেও—তাঁদের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুবিদিত। আত্মানুসন্ধানী ছোটগল্পকার সুবোধ ঘোষ যেখানে নির্মম সত্যকে অসাধারণভাবে তাঁর লেখনের টানে বর্ণময় করে তুলেছেন তা পাঠক মহলে বলার অপেক্ষা রাখে না। জীবনে বাস্তবতাকেই প্রাধান্য দিতে রোমান্টিকতার স্বপ্নজালকে তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন। জগদীশ গুপ্ত সেখানে মানুষের ভালোবাসার প্রতি একেবারে আস্থাহীন ছিলেন। দেহসর্বস্বপ্রেম, পুরুষের একমাত্র লালসা ও কামনা কিংবা মানুষ তার ভাগ্যের কাছে সত্যই অসহায় ও লাঞ্ছিত—এমনই জগৎ নিয়ে তাঁর কালজয়ী লেখাগুলি আজও মানুষের মনে করুণা অথবা ধিক্কার জাগায়। 'আদি কথার একটি' গল্পে যুবতী বিধবা কাঞ্চন তার পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে কুশিকে নিয়ে তেইশ বছরের কামার্ত-পাপিষ্ঠ-বর্বর যুবক সুবলের (খুশিকে সে বিবাহ করেছিল শুধুমাত্র কাঞ্চনকে ভোগ করার জন্যই) হাত থেকে মুক্তি পায়নি। নারী জীবনের অসহায়তা-আশা-ভরসাহীন এক জীবন যন্ত্রণা অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে ব্যর্থতা ও হতাশার কাছে জীবনের পরাজয়কে স্বীকার করেন নি। জটিল জীবন রহস্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে মানুষকে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে দিয়েছেন (প্রাগৈতিহাসিক)। তাঁর একাধিক গল্পে মানুষের কাছে মানুষের মূল্যবোধ ভালোবাসা চাওয়া-পাওয়া ধিক্কার-যন্ত্রণা সবকিছু যেন ভোরের সূর্যের মতো লাল হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে গরীব চাষী মজুরদের প্রতিরোধ ও সংগ্রামই আগাগোড়া প্রাধান্য পেয়েছে (হারানের নাতজামাই, ছোট বকুল পুরের যাত্রী)।

বিশ্বাস, বর্ষা : সুবোধ ঘোষের গল্প : আলো-আঁধারের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছুরণ
International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 126-140

অপরদিকে সুবোধ ঘোষ আগস্ট আন্দোলনের মহান সংগ্রামের সার্থক শিল্পরূপ দিয়েছেন। 'কালাগুরু' আর 'শিবালয়' গল্পে তার তাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত আমরা পাই। সুবোধ ঘোষ ব্যক্তিগত জীবনে বহু রকমের কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। রিলিফের কাজ, মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ, সার্কাসের কর্মী, কোলিয়ারিতে কাজ, অভ্রের খনিতে কাজ, ড্রাইভারের কাজ, জাহাজে কাজ যখন যেখানে যেভাবে কাজ জুটত সেইভাবেই, সেখানেই কাজ করে সংসারের দায়িত্বভার বহন করে চলেছিলেন, তাই বৈচিত্র্যময় চরিত্রগুলিকে যেন মনে হয় একদম কাছ থেকে দেখা, পাশের মানুষ। সুবোধ ঘোষ নিচুতলার মানুষের আলো-আঁধারের জীবন-বাস্তবতা আমাদের সামনে এনেছেন। সে পরিচয় তাঁর বিখ্যাত কিছু গল্পে আমরা পেয়ে থাকি—ফসিল, পরশুরামের কুঠার, সুন্দরম, গোত্রান্তর, চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ ইত্যাদি। এই আলোচনায় আমরা দেখতে চাই ছোটগল্পের সেই মোচড়টিকে যা থেকে গল্পকার পাঠককে উপহার দিতে পারেন—একটি শৈল্পিক পরিসমাপ্তি। কখন কোন আলোকিত চরিত্রের কাছ থেকে আমরা পাই নিরেট অন্ধকার আবার কখন তমসাবৃত কোন চরিত্রের কাছ থেকে পাই উজ্জ্বল আলোর রোশনাই—জীবনের সাতরঙ। এই আলোকিত রঙের বিচ্ছুরণই সুবোধ ঘোষের গল্পকে শতবর্ষ পার করাবে।

'সুন্দরম' গল্পের সুকুমার, বারোবছর বয়স থেকে যার বৈশিষ্ট্য ছিল নিরামিষ খাওয়া, কাব্য-সাহিত্য অস্পৃশ্য, এক মনে প্রাণায়াম, বিবাহে তার মন নেই; অন্তরে কেবলই অনুভব করে সে এক 'বিবাগী পুরুষ'। এইবার ছেলেটির পরিবর্তনে দেখা গেল, হিমালয়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে সংসার করার সাধ মেটাতে, বাবা কৈলাস ডাক্তারের কাছে ছুটতে হল ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে। সুকুমার এখন কাব্য পড়া আরম্ভ করল, সিনেমা দেখতে পিছপা হল না। এমনকি আখড়াতে গিয়ে মাথুর শুনতেও তার ভালো লাগে। চাঁদনী রাতে নেবু ফুলের ঘ্রাণ নিতেও তার ভুল হয় না। তার তপস্যার সার্থকরূপ ফুটে উঠল ভিখারী যুবতী তুলসীর দেহে। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে কৈলাস ডাক্তার আবিষ্কার করলেন তার ছেলে সুকুমারই তুলসীর ধর্ষক ও খুনী। ভিখারিনী তুলসী কিভাবে কখন মারা গেল তা অনেকেই জানতে পারল না, কিন্তু কৈলাস ডাক্তারের চোখে—"ক্লোমরসে মাখা একটা অজীর্ণ পিণ্ড—সন্দেশ পাউরুটি আর—বেলেডোনা।" পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে খুনী কে? কি-ই বা তার কারণ। আলোর বৃত্তের মধ্যে অন্ধকার খেলাঘরে সুকুমার তার পাশবিক যৌনতাকে চরিতার্থ করল—আর এঁটো জীবনের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তুলসী হারিয়ে গেল গভীর অন্ধকারে। পাঠককে মধ্যবিত্ত জীবনের অবশ্যম্ভাবী অবক্ষয়ের গ্লানি আচ্ছন্ন করে। আমরা দেখতে পাই আলোর মোড়কের মধ্যে অন্ধকারের মহীরুহ। এমনি ভাবেই গোত্রান্তর, শুক্লাভিসার, পারমিতা, অধীশ্বরী ইত্যাদি গল্পে আমরা দেখি কিভাবে আলোকিত চরিত্রের মধ্যে থাকে নিঃসীম অন্ধকার।

'গোত্রান্তর' গল্পে কাঁচা সড়কের ধারে জরাজীর্ণ একটা বাড়ি। চালাঘর থেকে ঘুনের ধুলো ঝরে পড়ছে। একপাশে মানুষের সাথে অনেকগুলো কচিকাচা, তার মধ্যে লেপ কাঁথার স্তূপ—এই হল এম. এ ডিগ্রির মালিক 'মধ্যবিত্ত' সঞ্জয়ের 'সুইট হোম'। বিংশ শতাব্দীর 'বিপ্লবী ধনবিজ্ঞানের' সূত্রগুলি যার জানা আছে সেই সঞ্জয় চারবছর ধরে

বেকারত্বের জ্বালায় ছটফট করছে। বিচিত্র প্রতিভার ভারে আক্রান্ত (খেলাধুলো, বিলিতি পত্রিকায় নিজের লেখা অর্থনীতির প্রবন্ধ, গান, অভিনয় ভূমিকম্পে সুকঠোর সেবাব্রত) সঞ্জয়কে তার মায়ের মুখেও গঞ্জনা শুনতে হচ্ছে। রতনলাল সুগার মিলে ত্রিশটাকা মাইনের চাকরি নিয়ে সঞ্জয়ের গোত্রান্তর হল। মিল এলাকার নাম রতনগঞ্জ। বাজার থেকে অনেকটা দূরে কুলি ও কর্মচারীদের ঘর। চুরাশী পরগনার দিগন্ত জুড়ে ছড়ানো ছিটানো আলবাঁধা-শাকসবজি ও আখের ক্ষেত। মিলের মালিক খুব ভালো লোক সে "প্রাতঃস্নানের আগে বাগানের যত পিঁপড়ের গর্তে মুঠো মুঠো চিনি ছড়িয়ে আসেন।" শুধুমাত্র নিজের প্রসপেক্ট নয়, আরও অনেক বড় এক কঠিন সাধনার ব্রত নিয়ে তার পুরানো সত্তার উপর নতুন সত্তার আস্তরণে সফলতা আনতে হবে। এই সুগার মিলে লোডিং মুহুরির চাকরি করে নেমিয়া। এই অদ্ভুত ধরনের লোকটির সাথে কর্তৃপক্ষের সম্পর্কটা কেমন যেন বিষাক্ত। নিজে যেমন কুৎসিত তেমনি আক্রান্ত প্লুরিসিতে নইলে মাঝে মধ্যেই 'লোকটা মেরুদণ্ডহীন, কেন্নোর মত অমন গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে থাকা'—কেন? চুরাশি পরগনাতে এসে সঞ্জয়ের বিদ্রোহী মনের আরও একবার গোত্রান্তর হল—সে এখন নেমিয়ার বোন রুক্মিণীর দেহ উপভোগকারী, তার লাঞ্ছিত পৌরুষকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে এই রুক্মিণী। রুক্মিণী বলল—"একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো তো আমার দিকে। রুক্মিণী গায়ের আঁচলটা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো—বুঝেছ? —হ্যাঁ বুঝেছি। সঞ্জয় গম্ভীর হয়ে গেল।" "ওলন্দাজের দেশে মুদ্রালক্ষ্মী যেন বিধবা হয়েছে....ওলন্দাজের বাজারের অভিশাপ এসে লাগল রতনলাল মিলে আর চুরাশী পরগণার আখের ক্ষেতে। মিলের ঘরে ঘরে মুনিবজী নোটিশ পড়ে গেলেন—মাইনে ও মজুরী শতকরা চল্লিশ কাট্। চোঙ মুখে নিয়ে মুনিবজী আখের দর ঘোষণা করলেন এগার পয়সা মন। ....সন্ধে পর্যন্ত মিলের ফটকে কর্মচারী ও কিষাণদের জনতা নিঝুম হয়ে বসে রইল। ... ভীড় সরাতে রায়বাহাদুর স্বয়ং হাতজোড় করে এসে দাঁড়ালেন—বাবালোগ বৃথা ঝামেলা কেন? এসব নসীবের মার। ভগবানের কাছে জানাও, যেন সুদিন ফিরে আসে।" সরকারী রেটের চেয়ে আরও কম রেটে রায় বাহাদুর ফসল কিনে নিতে চান। কিষাণদের মধ্যে মুনিরাম একমাত্র সাফ কথা বলার লোক। সে মনিবের এই ব্যবহারে বিমর্ষ ও ক্রোধান্বিত হল। সঞ্জয়ও এদের সামিল হল। বুড়ো বটের তলায় পুরানো শিবমন্দিরের সিঁড়িতে নিঃশব্দে তারা এসে দাঁড়াল—'প্রতিশোধ নিতে হবে'—সঞ্জয়ের বলার সাথে সাথে মুনিরাম লাফিয়ে ওঠে—"দোহাই বাঙালীবাবু। একটা উপায় বলে দাও।" সঞ্জয় প্রস্তাব করল—কেউ ফসল বেচবে না। সবাই বলল—ঠিক কথা। পাঠক বুঝতে পারে গোত্রান্তর ঘটল সঞ্জয়ের। কিষানরা আজ দলবদ্ধ, সমষ্টি বদ্ধ। কেউ তার ফসল বেচবে না, ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল শুকিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। আজ তারা কসম খেয়েছে। ঘরে ঘরে রাতের অন্ধকারে চলছে তাদের প্রস্তুতি—তারা আজ নিঃস্ব হলেও বেপরোয়া—তারা মাথা দিতেও জানে, নিতেও জানে। কিন্তু সঞ্জয়? নেমিয়ার গোল গোল চোখের চাউনিকে চড়ুই পাখীও ভয় পায় না সেই চোখের দৃষ্টিতে সঞ্জয় কি খুঁজে পেল? মৃত্যু ভয় নাকি আসন্ন বিপ্লবের সংকেত? "...আলোটা একটু উজ্জ্বল থাকলে দেখা যেত, দম্‌কা শিহরে তার হাঁটু দুটো থরথর করে উঠল।" ভয়ে নেতিয়ে পড়া সঞ্জয়

ক্যাশঘরের চাবির তোড়া নেমিয়ার হাতে দিয়ে অন্ধকারে দৌড় দিয়ে রুক্মিণীর ঘরের জানালায় চোখ রাখল—"মেঝের ওপর লুটোচ্ছে রুক্মিণী...। রুক্মিণীর প্রাণবায়ু যেন করাল ঝঞ্ঝার মতো সমস্ত শরীর একবার গুমরে উঠলো। ...অনাবৃত মসৃণ হাঁটুর ওপর অতিপরিচিত সেই নীল শিরার আঁকা-বাঁকা রেখাগুলি, জোঁকের মতো ফুলে উঠেছে।... রুক্মিণীর সমস্ত যন্ত্রণা ধন্য করে কপট মৃত্যুর আড়ালে এক নবজীবনের রক্তবীজ পৃথিবীর মাটিতে হাত বাড়িয়েছে।" শিক্ষিত সঞ্জয়ের নির্দেশে কৃষকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে—পাশাপাশি মধ্যবিত্ত সঞ্জয়ের অন্ধকার চরিত্র ফুলে উঠেছে রুক্মিণীর শরীরে। একদিকে নেমিয়া—অপরদিকে রুক্মিণী—আলো-অন্ধকারের যুদ্ধে সঞ্জয় বেছে নিল অন্ধকারের পক্ষ—মধ্যবিত্ত সঞ্জয় মাঠের ঢালু খাড়াই খাদ গর্ত ডিঙিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে থামল মিল ফটকের 'ঘোলাটে আলোর' সামনে। আজ তার কাছে নেমিয়া ও রুক্মিণী—এ দুটি ভাইবোন 'বর্বর পৃথিবীর দুজন কুপিত ডাইনী'—তাকে সর্বনাশের আহ্বান জানিয়েছে। রায়বাহাদুরকে সঞ্জয় আসন্ন বিপ্লবের কথা জানিয়ে ঘোড়ার পিঠে পঞ্চাশ টাকা বকশিশ নিয়ে রওনা দিল। গল্পের শেষে—"ঘোড়াটা একটা স্রোতে পা দিয়েছে। সঞ্জয় ঘোড়া থেকে নেমে স্রোতের ধারে বসে আঁজলা ভরে জল খেল। গেরস্থের মুর্গি চুরি করে একটা শেয়াল ভেজা গলির উপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল। সেও জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামাল।" আমরা দেখলাম এক অদ্ভুত গোত্রান্তর। তার জুড়ি মেলা ভার। সুবোধ ঘোষের গল্পে এমন নিরেট তমসাবৃত অনেক চরিত্র আছে যারা হঠাৎ কোন ঘটে যাওয়া ঘটনার ঝলকে উজ্জ্বল রূপ পায় আবার কখনো আলোকিত চরিত্ররা ধীরে ধীরে প্রবেশ করে অন্ধকার গহ্বরে।

'পারমিতা' গল্পে চাঁদি বাজারের সরু রাস্তার ধারে এক বাঙালি ফটোওয়ালা রায়বাবুর একটা স্টুডিও ছিল, তারই স্ত্রী পারমিতা। হঠাৎ-ই দুবার রক্তবমি করে রায়বাবু মারা যাবার পর একত্রিশ বছরের যুবতী বিধবা পারমিতাকে নাচের দিদিমণি হিসেবে বহাল রেখেছিল বিপত্নীক মনোময় মজুমদার। দুটি বছরের একান্ত নিবিড়তায় অতীত স্মৃতি তার কাছে আজ হালকা হয়ে গিয়েছিল—হর্ষনাথ তাকে মিসেস রায় বলে সম্বোধন করে, এখন মজুমদার বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী। মণ্টুর ভালোমন্দ সব দায়-দায়িত্বই তার হাতে। কিন্তু মণ্টুর একটা কথা পারমিতার বুকে গোপন একটা মায়া ও বেদনার সৃষ্টি করে—"পারুমাসী তোমার স্বামী কোথায়? হারিয়ে গেছে"—কিন্তু খুব শীঘ্রই হয়তো তার স্বামীকে খুঁজে পাবে। পারমিতার মনে অনেক স্বপ্ন, অনেক ইচ্ছে, একটু একটু করে বাসা বাঁধে। শিকার করে ফিরে আসার পর ক্লান্ত মনোময়কে এক কাপ চা করে দিতেও পারমিতার ভুল হয় না। পারমিতার কাছে—"শিকার থেকে ফিরে আসা মনোময়ের ক্লান্ত চেহারাটাও কেমন ঝলমল করে, মুখের উপর একটা লালচে আভা টলমল করে এমন রূপবান পুরুষ লাখে একজন মেলে কিনা সন্দেহ। চোখ দুটোও সুন্দর—সত্যিই ভ্রমরকালো চোখ।" সেই চোখে পারমিতা কি দেখেছিল। প্রেমের একটা সুপ্ত সরুপথ নিঃশব্দ মদিরতায় পারমিতার চোখে স্বপ্ন জাল ছড়িয়ে ভোরের ঝরা শিউলির স্নিগ্ধ গন্ধ ছড়িয়ে ভালোবাসার কাঙ্ক্ষিত লাল সূর্যকে আলিঙ্গন জানিয়েছিল—কিন্তু সেই লাল সূর্যটা (মনোময়) যেদিন পারমিতাকে পণ্য হিসেবে দাম দিতে চাইল, ভালোবাসাকে ব্যবসাক্ষেত্র করে তুলতে চাইল সেদিন—"পারমিতার

বুকের ভেতর থেকে যেন একটা নিষ্ঠুর বিস্ময়ের আক্ষেপ আর্তনাদ হয়ে বেজে ওঠে।" মনোময় পারমিতাকে ডেকে বলে—আমার গেস্টদের নাচ দেখিয়ে তুমি খুশি কর। চাবুকের মতো মনোময়ের কথাগুলো পারমিতার বুকে পড়তে থাকে। মুখোসের আড়ালে ছিল এই নোংরা লোকটা। কোনো এক গেস্ট বলে ওঠে—'ড্রেস-ফ্রেস না থাকলেই ভাল'—এ কথাতে সম্মতি দিয়ে মনোময় বলে ওঠে—'এখন ডুইওর ডিউটি।' মুহূর্তের মধ্যে পারমিতা বিগত দুটি বছরে কোনো স্মৃতি হাতড়িয়ে এ ধরনের কোনো ঘটনার স্পর্শ মাত্র পেল না—আর একবার সে ভালো করে মানুষ মনোময়ের ভ্রমরকালো চোখের ভেতর সত্যিই কোনো কালি আছে কিনা তা বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু না মানুষের চোখের ভেতর এক পশুর চোখ লুকিয়ে আছে। যে কিনা এক 'বুনো হরিণীর' নরম মাংসের ঘ্রাণ পাবার জন্য উগ্র ও লুব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। হর্ষনাথ, মিস্টার মজুমদারের শিকারের ম্যানেজার। এই লোকটির সঙ্গে পারমিতার কথা হতো খুবই অল্প। লোকটিকে তার ভালোও লাগত না। কিন্তু মাঝে মধ্যে মণ্টুকে সাথে নিয়ে বেড়াতে যাবার বায়না মেটাতে লোকটির সাথে তাকে যেতে হত। সেদিন ছিল আষাঢ়ের কোনো এক বিকেল। লোকটির সাথে পারমিতা ও মণ্টু বাদলমহল দেখতে গিয়েছিল। সেদিন লোকটির বেহায়া চাউনি পারমিতাকে অসমাপ্ত ভাবে বলেছিল—'আপনি যেমন বিধবা আমিও তেমনি বিপত্নীক।'—পারমিতার বেড়াতে আর ভালো লাগেনি। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিল—কিন্তু মনোময় যাকে ঘিরে সে স্বপ্ন বুনেছিল তার কাছে যাবার জন্য সে এতো উদগ্রীব ছিল—একটি ডাকের অপেক্ষায় যার দেহ চাঞ্চল্য নানা উৎসবে বর্ণময় হয়ে উঠেছিল সেই মানুষটি আজ তার চোখের দিকে তাকিয়ে কি বলেছিল? বুকের ভেতর উতলা বাতাসের চাপটাকে কোনোমতে সরিয়ে এসে দাঁড়ালো গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজানো মদিরাসক্ত ঘরের ভেতর। অবাক বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল তার ভাবনার দল। আর হর্ষনাথ যাকে এ পৃথিবীর খারাপ মানুষ বলে মনে হয়েছিল কিন্তু আজকের এই, উৎসব মাখা স্যাম্পেনের আসরে সে যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে কি সে পারমিতার প্রতি মনোময়ের এই আচরণকে সমর্থন করছে না? গল্পের শেষে দেখি লাল আলোয় টলমলে যে মুখটা নিরেট অন্ধকারের চাদরে ঢেকে গেল—সে হল মনোময়, আর হর্ষনাথ অন্ধকার ঘর থেকে বাইরের আলোয় পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশ করল— '...হর্ষনাথ যে থরথর করে কাঁপছে, ... পারমিতার মুখটা যেন একটা দুঃসহ ঘৃণার ছবির মত হর্ষনাথের চাহনিকে অপমান করছে। আর বোধ হয় সহ্য করতে পারবে না, আর দেরিও করে না হর্ষনাথ। দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।' হর্ষনাথ পারমিতাকে ভালোবেসে তাকে সে গ্রহণ করতে চেয়েছে আর মনোময় আলোর পৃথিবী থেকে মনের আলোকে নিভিয়ে অন্ধকার করে রেখেছে। সেই কারণে পারমিতা মনোময়কে বলতে পেরেছে—"মণ্টু যদি জিজ্ঞেস করে পারুমাসী কোথায় গেল, তবে বলে দেবেন, পারুমাসী এতোদিনে আবার স্বামীকে পেয়ে স্বামীর কাছে চলে গিয়েছে।"

সুবোধের একটি ব্যতিক্রমী গল্প হিসেবে 'অধীশ্বরী' গল্পটিকে আলোচনা করা যেতে পারে। ধীরাজ জয়ন্তী জুট মিলের ওয়ার্কস ম্যানেজার। ব্যারাকপুরে কাকার দেওয়া তিনতলার একটি বাড়িতে সে একাই থাকে কিন্তু ভাড়াটে হিসেবে থাকে ইন্দুলেখা

নামে এক বিয়াল্লিশ বৎসরের মহিলা এখনও দেখতে তাকে নেহাত মন্দ লাগে না। তার বিশেষত্ব হল, হাসলে তার দুই চোখে যেন 'হীরের কুচি' লুকিয়ে থাকে কিংবা যখন কোন একটা বিষয় নিয়ে ভাবে তখন গম্ভীর হয়ে যায় তার চোখের তারা। গল্পের বাঁধুনিটা খুব সুন্দরভাবে রচনা করেছেন লেখক—পিসিমা ধীরাজের এই বিয়ে না করাটাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখছেন না এমনকি ভাড়াটে ইন্দুলেখাকেও তার পছন্দ হচ্ছে না। এই ধরনের কথাবার্তা হয়তো বা ইন্দুলেখার কানে পৌঁছে গিয়েছিল। ঠিক তখনই—"...ধীরাজের বৌদিরা শুনতে পেলেন ও জানতেও পারলেন যে ধীরাজের বিয়ের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ইন্দুলেখা।... আপনারা সবাই যদি চেষ্টা না করেন, তবে আমি একা কী করতে পারি। ধীরাজের বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজে খুঁজে আমি তো হয়রান হয়ে গেলাম...।" আর ঠিক তখনই "তবু দ্বীপ জ্বলে" নাটকের জয়াকে দেখে ইন্দুলেখার খুব পছন্দ হয় এবং মনে মনে ধীরাজের সাথে বিয়ে দেবার জন্য মনস্থির করে। ইন্দুলেখার এই নতুন পরিচয়ে করুণা বউদি, সুহাসদি ও পিসিমা তাদের কুমন্তব্যের জন্য লজ্জা পেল। যাইহোক জয়া ওরফে শোভার সাথে ধীরাজের বিয়ে হয়ে গেল। ফুলশয্যার রাতে ইন্দুলেখা সৌদামিনীর বিয়ের দীর্ঘ গল্প বলতে বলতে যখন থামল তখন 'ওকী, কাক ডাকছে বোধহয়। ভোর হয়ে গেল নাকি?' এভাবেই অনেক রাত পার হয়ে যায় নিঃশব্দে অথবা দরজার সামনে দিয়ে চলে যাওয়া কারও পায়ের শব্দে আবার কখনও বা একা একা রাত জেগে। আলো আঁধারি, গুহাবৃত তিমির বিলাসী—অবৈধ সম্পর্কের নাগপাশে ইন্দুলেখা ধীরাজকে জড়িয়ে রেখেছে। ধীরাজের ভালোমন্দ, কখন কি খাবে—এ সবের দায়ভার সবটাই ইন্দুলেখার—জয়ার কোনো স্পর্শ ধীরাজের শরীরে নেই মনেও নেই। একদিন একটা চিঠি এলো—শোভাকে আবার 'তবু দ্বীপ জ্বলে'—নাটকে জয়া চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। ইন্দুলেখা এক কথাতে রাজি হয়ে যায় এবং শোভাকে পাঠিয়েও দেয়। নাটকের শেষ দৃশ্যে জয়া তার স্বামীর ছবিটাকে আছড়ে ভেঙে ফেলে এবং বিকাশ নামে এক আগন্তুকের সাথে চলে যায় তার মায়ের কাছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই শেষ দৃশ্যটা না ধীরাজ না ইন্দুলেখা কারোর-ই ভালো লাগল না। শেষ দৃশ্যটা দেখে সত্যই চমকে গেল ইন্দুলেখা—গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটা নিরেট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে গিয়েছে তার নরম ঠোঁট। আর চোখের তারার ভিতরে লুকানো "সেই হীরের কুঁচিটা বোধহয় মাটির কুঁচি হয়ে গিয়েছে।" শোভা তার সোদপুরের পঞ্চাননতলার বাড়িতে ফিরে গেছে—আর কখনো ফিরবে না ব্যারাকপুরের ধীরাজ ও ইন্দুলেখার সংসারে। তিমিরবিলাসী ধীরাজ ও ইন্দু প্রবেশ করল অন্ধকার গুহায় আর শোভার আলোকযাত্রার বিচ্ছুরণ আমাদের চমৎকৃত করে।

'বারবধূ'তে তারকেশ্বরের পতিতা পঞ্চী বিবিকে মাসহারা দিয়ে ঘরে রাখতেন ভদ্রলোক প্রসাদবাবু। কিন্তু বরাকর কলোনীর বাংলোতে চেঞ্জে এসে আর পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে গিয়ে পঞ্চীবিবি তার পায়জামা আর সিগারেটকে আড়াল করেছিল শাড়ি দিয়ে। প্রসাদের 'মিথ্যা' স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে সে বোধ হয় পঞ্চীকে ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু আভার সঙ্গে প্রেমের খেলা শুরু হতেই প্রসাদের স্বাদ বদল হল। সে ভীত হয়ে পড়ল, মধ্যবিত্ত সুলভ স্বার্থপর আত্মপ্রতারক আশঙ্কায় সে

বলে—"আজ যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়, তুমি কি বস্তু? তাহলে আমি কোথায় থাকি? তুমি আমার মান মর্যাদার চাবিকাঠি আগলে বসে থাকবে তা হয় না; তোমাকে ভয় করে চলতে হবে, তোমার মেজাজ মর্জির জন্য সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হবে এ হয় না।" আসলে প্রসাদবাবু মধ্যবিত্তের তাবেদারিকে ত্যাগ করতে পারেনি। মধ্যবিত্ত সুলভ ভালোমানুষি দেখানোর একটা ভাবনা তার মধ্যে ছিল। পতিতা পঞ্চীকে তার ভোগ বাসনার জন্যই দরকার সেখানে মানুষ হিসেবে তাকে পাবার বাসনা ছিল না। পঞ্চী নিজেকে 'লতা' মনে করলেও প্রসাদবাবু পঞ্চীকে রক্ষিতা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারেনি। আসলে লেখক সমাজের ভদ্র মানুষের অন্তরে অন্ধকার জগতে একটা টানাপোড়েন, একটা দ্বন্দ্ব তুলে ধরতে চেয়েছেন—যেখানে থেকে বেরিয়ে আসতে প্রসাদের মতো ভদ্র মানুষেরা পারে না। যেমন পারেনি স্নানযাত্রাতে ইন্দুনাথ।

'স্নানযাত্রা' গল্পে, বটেশ্বরপুরে স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে এক মাসের একটা মেলা হয়। বৈশাখী পূর্ণিমার কোনো একদিনে আরম্ভ হয় এবং জৈষ্ঠ্যের পূর্ণিমাতে শেষ হয়। এই একমাসের মেলাকে উপলক্ষ্য করে জীবনের নানা রঙ, রকমারি জিনিসের বাহার, মানুষের ভিড়, বহু কেনাবেচা। আর এসে ঘর বাঁধে কয়েকদিনের আনন্দ-কোলাহল ও ব্যস্ততা নিয়ে বারাঙ্গনা নারীর দল। রিলিফের কাজে জনাবিশেক ছেলে নিয়ে ইন্দুনাথ এসেছে এই গ্রামে। এবারে এই বটেশ্বরপুরে পতিতাদের কোনো ব্যবসা চলবে না—এই পরোয়ানার মুখ্য ভূমিকায় ছিল ইন্দুনাথ। সেইজন্য এখানে পিকেটিং বসানো হয়েছে। সেই জন্য ঘরে ঘরে চাল ডাল বিলি করবার একটা ব্যবস্থাও করা হয়। সকলেই রিলিফের চাল ডাল ঘরে নিয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে 'উর্বশী ধরনের' এক তরুণী তা নিতে অস্বীকার করে। পরে আবার নেয়ও। একদিন ইন্দুনাথ চাল ডাল দিতে গিয়ে সেই উর্বশী ধরনের মেয়েটাকে অভদ্র সাজে আর দেখতে পেল না—সাধারণ সাজে এক তরুণী। হঠাৎই ইন্দুনাথ বলে ফেলে—'এখানে আপনাকে একটুও মানায় না ঘরে চলে যান।' পতিতা সোনালীর আজ নিজের কোনো ঘর নাই। তবে এখন থেকে সে নিজের কালিমাখা জীবনটাকে 'পূর্ণিমা'র আলো দিয়ে মাখিয়ে রাখবে ভাবল। নতুন একটা ঘর বাঁধবার স্বপ্নে সে ফুলের মতোই স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। মনে মনে ঠিক করেছিল যে রিলিফের কাজ শেষ হলে ইন্দুনাথের সাথে চলে যাবে। কিন্তু ইন্দুনাথ যখন বলে আমি আজই যাব। 'কিন্তু সেজন্য তুমি তৈরি হলে কেন?' পূর্ণিমার স্বপ্ন ভেঙে গেল, তার আর আলোর জগতে ফেরা হল না। কিন্তু ইন্দুনাথ মধ্যবিত্ত মানসিকতার নাগপাশে বন্দী। সেদিন ইন্দুনাথের যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সোনালীকে পাঁকমাখা জীবনের নর্দমা থেকে সমতল ভূমিতে তুলে আনতে পারেনি, পারেনি জীবনের সাথে বাঁধতে। সে পূর্ণিমাকে অনেক ভালো কথা বলেছে, এমন কি তার হাতে তুলে দিতে চেয়েছ 'সহজ শিশুপালন' বই। কিন্তু পূর্ণিমা তার অতীত, তার পঙ্কিলতা তার কালিমাকে মুছে ফেলেছিল, পতিতা হয়েও মনের শুচিতাকে, মনের ভালোবাসাকে সে নষ্ট করেনি—তাইতো সে আবেশ মাখা কণ্ঠে বলতে পেরেছিল—"আপনি চলে যান। ...আমার এখানে এখন মেজকর্তা আসবে। ...চিরঞ্জীব আসবে। আপনার আসতে নেই।" যে বেশ্যা মেয়েটিকে তার পথসঙ্গী করতে ইন্দুনাথ ভয় পেয়েছিল তাকেই আবার ভোগ করতে তার কামনাতে কোনো দ্বিধা জাগছে না।

সুবোধ ঘোষের গল্পে আলোকিত চরিত্রগুলি মাঝে মাঝেই এভাবে অন্ধকার জগতে হাঁটতে থাকে আর অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া আলোর দিশারীরা পূর্ণিমা থেকে আবার সোনালীতে রূপান্তরিত হয়।

'মিছার মা' গল্পে ঢাকুরিয়া স্টেশন থেকে একটু দূর ডায়মন্ড হারবারের দিকে যেতে গিয়ে বাঁদিকে নেমে গিয়েছে যে বস্তিটা সেই বস্তিতে থাকে কয়েকটি 'গতর খাটা' পরিবার। তাদের ঘরে কেরোসিনের কুপি জ্বালা আলোটা কখনও কখনও দেখা যায়। পুঁটির মা, হরির মা, নুটুর মা—এদের সাথে মুক্তোও থাকে। মুক্তোর জীবনটা অন্য, এদের মতো নয়। তার স্বামী কবেই যেন হারিয়ে গিয়েছে। সে জানে না সে সধবা না বিধবা, মিথ্যে সন্তানের মা হয়ে আজ সে 'মিছার মা'। ট্রেনের ইঞ্জিনের লাল ধোঁয়া ছড়ানো অন্ধকারে একা বসে বসে মুক্তো ভাবতে থাকে নন্দর কথা। যে নাকি বাঘ ভালুক নয়—সত্যিই একটা 'মানুষের মতো মানুষ'। মুক্তোকে ভালোবাসে, তাকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে চায়। এই জল পড়া বস্তির চালাঘর ত্যাগ করে অন্য কোথাও যেখানে তাদের কেউ চিনবে না। মুক্তো তাতে রাজি হয়, সে পাঁচবাড়ির বাসন মাজার কাজ ছেড়ে দেয়। কেউ টাকা দিল, কেউ বা আঠাশ দিনের মাইনে হিসেব করে নকল টাকা দিয়ে ঠকাল। মুক্তো সে বাড়ির সামনে এসে অনেক চিৎকার করে ক্লান্ত হয়ে অন্য এক বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। এ বাড়ির লোকজনেরা একটু আলাদা—তার মাইনেই তো তিনমাসের বাকি। লোকগুলি খারাপ নয়, কিন্তু বাড়ির গিন্নিটা বেশ চালাক, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে কাজ করিয়ে নিত। প্রায় বছর তিনেক আগে সে এ বাড়ির কাজটা ছেড়ে দিয়েছিল, তখন বৌদি সাত-আট মাসের সন্তান সম্ভবা। মুক্তোকে আরও একটা মাস থেকে যেতে বলেছিল কিন্তু মুক্তো থাকেনি। এসব ভাবতে ভাবতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে মুক্তো দেখল কলতলাতে বৌদি এঁটো বাসন মাজছে। হাসি মুখে বৌদি তাকে বসতে বলে, এতদিন কোথায় ছিল সে সব কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু মুক্তো মনে মনে খুশি হলেও গম্ভীর হয়ে থাকে—কেননা আবার সেই মিষ্টি কথা বলে পাওনা টাকা না দেবার মতলব। মুক্তো বাচ্চার কথা জিজ্ঞেস করেই ঘরের ভেতরে পা রাখে কেননা এ ঘরের প্রতিটি কোণ তার চেনা। কিন্তু ঘরের ভেতরে ঢুকে তার খুব অবাক লাগল—ঘরের সেই আবসাবপত্রগুলি আজ আর নেই—যে আলনাটা দাদাবাবুর ধুতিতেই শুধু ভরে থাকত আজ সেখানে আধময়লা একটা ধুতি ও গেঞ্জি ঝুলছে। তক্তপোশের উপর একটি দুই বছরের শিশু (টুলু) যার দুমাস ধরে জ্বর কমছে না আর তার মাথার কাছে বসে বাতাস করছে রমা, বৌদির বড় মেয়ে। ঘরের এই দীনতা দেখে তাদের দারিদ্র্যতার কথা বুঝতে মুক্তোর বেশি সময় লাগল না। সে বলল—'তোমাদের এ কিরকম দশা হলো বৌদি, কিছুই যে বুঝতে পারছি না। বৌদি বলে—চাকরি না থাকলে যা হয় ...' নিজের অজান্তেই মুক্তো জিজ্ঞাসা করে—'ছেলের ওষুধ-বিষুধ ঠিক চলছে তো, না তাও...।' বৌদি চুপ করে থাকে। মাত্র পনেরো টাকার অভাবে একটা ওষুধও কেনা হয়ে ওঠেনি তাদের। দিন উপোসের মতো করে তাদের দিন কাটছে। মুক্তো তার নিজের আঁচলের গেঁড় খুলে টাকা গুনে কাগজ লেখা ওষুধের নামটা নিয়ে চলে যায়। ওষুধ খাইয়ে টুলুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। অসুস্থ টুলুর একটা মায়ায় জড়ানো তুলতুলে নরম স্পর্শ ও গরম নিঃশ্বাস মুক্তোকে একি

আবেশে চঞ্চল করে তুলল? সারা দিনের ক্লান্তিতে মুক্তোর চোখে একটু তন্দ্রা এসেছিল, সন্ধ্যে নেমে এসেছিল সে টের পায়নি। হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে—মুক্তো বলে—'বৌদি এবার আমি যাই'—এবারে আর একটি শব্দ কচি শাবকের অদ্ভুত আবেশে মেশোনো আদেশ—'তুমি যাবে না'—মুক্তো যেতে গিয়েও আবার টুলুর কাছে ফিরে এসে বলে—'কি বলছ বাবু?' মুক্তোর শাড়ির আঁচলটাকে মুঠো করে ধরে দুর্বল কণ্ঠে বলে—'যাবে না।' সে রাতে মুক্তো বস্তির ঘরে ফিরে গেল। অন্ধকারে চুপিচুপি একটি ছায়া শরীর কাঠের দাওয়াতে উঠে এসে বলে—'চল মুক্তো'। মুক্তো বলে—'আমি যাব না।' নন্দ আশ্চর্য হয়। তবে কেন তাকে মিথ্যে কথা বলে ঠকাল? আর তার না যাওয়ার পিছনে সত্যিকারের রহস্যটা কি? নন্দ মুক্তোর কাছে সে কথা জানতে চায়। মুক্তো বলে—'ছেলে ফেলে রেখে চলে গেলে পাপ হবে।' নন্দর সাথে মুক্তো চলে যেতে পারেনি। পেটের খিদে ও শরীরের খিদেকে সে জয় করতে পারল একটি কচি শিশুর শরীরের গন্ধ ও স্পর্শ পেয়ে। মা না হয়েও বস্তি জীবনের গন্ধ মাখা এক রমণীর সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ বিচ্ছুরিত হয়েছে কিভাবে, লেখক আমাদেরকে সেই সন্ধানই দিয়েছেন। নিচুতলার মানুষের অন্তরেও যে মহৎ ভাবনা কাজ করে, পাওনা টাকা না পেয়েও তার নিজের জমানো স্বল্প সঞ্চয় থেকে অনাত্মীয় কাজের বাড়ির অসুস্থ ছেলের জন্য ওষুধ কেনা ও তাকে ফেলে একান্ত নিজের সুখ ও লালসাকে ত্যাগ করতে পারা সত্যিই কঠিন। সুবোধ ঘোষ আমাদেরকে এইরকমই বেশ কিছু চরিত্র উপহার দিয়েছেন।

'বহুরূপী' গল্পে হরিদা বহুরূপী। বিভিন্ন সাজে তাকে পথে ঘাটে দেখা যায়। কোনোদিন বাউলের বেশে, কোনোদিন কাপালিক, কখনও বা বোঁচকা কাঁধে নিয়ে কাবুলিওয়ালা আবার বাঈজীর বেশে হাতে ফুলসাজি নিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে সিকি চেয়ে নিতে তার ভুল হয় না। এতে তার পেট চলে না, তা সে চা দোকানী। আসলে বাঁধাধরা জীবনে ঘড়ির কাঁটার টিক্ টিক্ শব্দে সে তার জীবনের চলাকে পছন্দ করে না, বৈচিত্র্যময় জীবনে হরিদা একঘেয়েমি উপেক্ষা করে, অভাবটাকেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু জগদীশ বাবুর বাড়িতে বিবাগীর ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে তার অন্য পরিচয় আমরা পাই। দুঃখকে জয় করা, পাপীকে ক্ষমা করা, মৃত্যুকে স্থির থাকা—এ ধরনের অদ্ভুত দার্শনিক কথা বলে উদাত্ত শান্ত সমাহিত। তার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে যেন আজ লোভ-লালসা, বিত্ত-বাসনা, অর্থহীন এক রিক্ততায় ঝরে পড়ছে। হরিদা জগদীশবাবুর কাছ থেকে কোনো অর্থ না নিয়ে, কোনো সেবাগ্রহণ না করে শুধুমাত্র এক গ্লাস ঠান্ডা জল খেয়ে ভবতোষ, কথক, অনাদি—এদের সকলকে অবাক ও সম্মোহিত করে দিল। ঘরে যার হাজারও দৈন্য, হাজারও অভাব, কখনও হাঁড়িতে চালের বদলে শুধু জল ফুটেছে, সেই হরিদা অসম্ভব এক চরিত্রে অভিনয় করে টাকার থলিকে উপেক্ষা করে ঈশ্বরের পরমাত্মার কথা শোনালেন। চা দোকানী হরিদার একশো টাকায় অন্ততপক্ষে বেশ কিছুদিন ভালোভাবে চলত। কিন্তু এই সর্বহারা মানুষটির উপদেশ এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। শুনিয়েছে জীবনের এক নতুন বার্তা, দেখিয়েছে এক নতুন আলো। দান করেছে এক মহাশক্তি—দৈন্যতাকে জয় করা, ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা করা। এমনকি জগদীশবাবু যখন হরিদাকে তীর্থ করার জন্য কিছু

টাকা দেবার কথা বলেন তখনই এই ভিখারী মানুষটি নিরাসক্ত ভাবে বলতে পারে—'আমার বুকের ভিতরেই যেসব তীর্থ। ভ্রমণ করে দেখবার তো কোন দরকার হয়না।' ...আমি যেমন অনায়াসে ধুলো মাড়িয়ে চলে যেতে পারি, তেমনই অনায়াসে সোনাও মাড়িয়ে যেতে পারি।' কখনও কখনও এ ধরনের চরিত্রের মধ্যে লেখক আলোর ফোকাস ফেলে সামাজিক চৈতন্য বোধকে তুলে ধরতে চান।

'আত্মজা' গল্পে বিজাতীয় অন্য ধর্মের এক শিশু কন্যা যার পরিচয় জীর্ণ মলিন ছেঁড়া কাঁথার মতো, রেলইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবুর ট্রলিম্যান (ভাল্লু কুলি) ও তার স্ত্রী কলেরাতে মারা যাবার পর ছয় মাসের শিশু কন্যাকে অন্যসব কুলিরা মিলে উপেনবাবুর বাড়ির সামনে রেখে যায়। তারপর যত্নে-অযত্নে বেড়ে ওঠা কোমল স্বভাবের অনামিকা মেয়েটি আজকের অম্বালিকা ওরফে অম্বি। প্রথম প্রথম সকলেই জানত—উপেনবাবুর দুই মেয়ে—রমা ও অম্বা—দেখতেও বয়সে প্রায় একই রকম। তখন থেকেই উপেনবাবু বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়েন। সেক্ষেত্রে অনেকবার তাকে অন্য কোথাও রাখার ব্যবস্থা করতে করতেও করতে পারেননি। যেমন তেমন একটি খেটে খাওয়া সৎ ছেলের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করতেও পারেননি। অজানা ভাগ্যের হাতে যার জীবন বাঁধা পড়ে আছে সে কি করবে? অন্যের বাড়িতে আজ শুধু সে আশ্রিতা বা 'নিজের মেয়ের মতো' কিন্তু মেয়ে নয়। মাতৃস্নেহ ও পিতৃস্নেহ যাদের কাছ থেকে সে পেয়েছে তাদেরকে 'বাবা-মা' না বলে 'আপ্পি' ও 'আম্মি' বলে শুধু ডাকবারই অধিকার পেয়েছে। রমার মতো পড়াশুনা, সেলাই শেখা বা গান করা তার হয়ে ওঠেনি। অথচ সেলাই না শিখেও সে ভালো সেলাই করতে পারত। গান না শিখেও সে ভালো গান গাইতে পারত। কিন্তু উপেনবাবু অম্বার প্রতিভা দেখে ভীত হতেন ও বিরক্ত বোধ করতেন পাছে যদি রমাকে ছাপিয়ে যায় এই অনাত্মিক মেয়েটি? কিন্তু ভাগ্যের কাছে সকলেই পরাজিত। পরাজিত হল উপেনবাবুর পিতৃহৃদয়। অধীর যখন রমাকে বিয়ে না করে অম্বাকে বিয়ে করতে চাইল তার জাত বিচার না করে, শিক্ষার গরিমাকে আঁকড়ে না রেখে শুধুমাত্র মানবিক মূল্যবোধের বিচার করে। তখনই উপেনবাবুর অন্তরে জমানো অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো এক আলোছড়ানো গুমরে ওঠা কান্না। নিজের মেয়ের জন্য যা যা ভেবেছিলেন, সেইসব ভাবনাগুলোকে মিথ্যে করে দিয়ে ভালোবাসা-জয়ের মুকুটটা বিজাতীয় তনয়া অম্বালিকাই তার পালিত পিতা-মাতাকে পরিয়ে দিল—'আমি তো তোমাদের ছেলের মতোই। চিরকাল তোমাদের কাছেই থাকব।' বুকের ধাক্কাটিকে কোনো রকমে সামলে নিয়ে উপেনবাবু ও চারুবালা এক সাথেই আস্তে আস্তে বলেন—"ছি ছি ওরকম করতে নেই অম্বি, সব মেয়েরই বিয়ে হয়, আর বাবা-মাকে ছেড়ে থাকতে হয়।" আসলে উপেনবাবুর হৃদয়ে বাইরের মনে অন্ধকারের কালো একটুকরো মেঘ থাকলেও ভেতরটা ছিল—আলোকিত, নইলে কেনই বা বিশ বছর ধরে অনাথা একটি মেয়েকে কন্যা-স্নেহে আশ্রয় দিল? প্রশ্ন থেকে যায় মনের গভীরে। তাই আজ যেন মান-অভিমানে ও ভালোবাসার ঝড়বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল মেঘের কালো দাগ। অন্তরের আলোতে ফুটে উঠল উপেনবাবুর পিতৃহৃদয়ে ভালোবাসার এক আর্তিমাখা লাল গোলাপ। পরের আত্মজ যে এইভাবে অপত্য-স্নেহের বন্ধনে নিজের

আত্মানুভূতির সাথে মিশে যাবে কে ভাবে একথা? এভাবেই এক বিজাতীয় মেয়ের প্রতি ভালোবাসা উপেনবাবুর হৃদয়ের ক্যানভাসে আলোর প্রতিফলন ঘটাল।

একইরকম অনুভূতির প্রকাশ দেখি 'অনাত্মিক' গল্পে—অনন্ত মিত্তিরের মধ্যে যাকে 'একানড়ে' বলে পাড়ার ছেলেরা সম্বোধন করে। পাড়ার লোকেরা তার বাড়িতে চা পর্যন্ত খায় না, কারণ তার একটিমাত্র চায়ের চাপ। খরচ বাঁচিয়ে, ফালতু খরচ না করে, ভালো ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবে এই তার সাধ ও স্বপ্ন। কিন্তু দূর সম্পর্কের এক অনাত্মীয় বসন্তদার মেয়ে (চারু) ও স্ত্রী (মঙ্গলাবৌদি) তার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলে সে ভীত হয়ে পড়ে। পাছে পিতৃহীন এই মা-মেয়ের পরিবারকে অর্থ সাহায্য করতে হয়? তাহলে যে মেয়ের বিয়েতে টাকায় টান পড়বে। সেই ভাবনা মনের ভেতর পোষণ করে সে চারুর সাথে ভালোভাবে কথা পর্যন্ত বলে না। কিন্তু যেদিন নিজের মেয়ে শুভার ভালো ঘরের ছেলের সাথে বিয়ে হয়ে গেল, মাঝরাতে তার যখন জল খাবার কথা মনে হয়েছে, ঠিক তখনই চারু জলের গ্লাস হাতে কাকাবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে—নিজের মেয়ের বিদায়ের পর যে বাবার চোখে কখনও জল দেখা যায়নি, মুখে সবসময় একটা প্রসন্নতার হাসি লেগেছিল, সেই অনন্তবাবুর যেদিন চারু তার বাড়ি থেকে চিরকালের মতো চলে গেল সেদিন বদলে গেল অনন্তবাবুর অন্তরাত্মা। তাকে হারিয়ে দিয়ে গেল এক দরিদ্র কন্যা। চারুর চলে যাবার পথের দিকে চেয়ে একি হলো! 'একলাসুখী' জগৎটা তার কাছে মিথ্যে বলে মনে হয়, পায়ের তলার মাটিটা আস্তে করে সরে যায়, হৃদয়ের জায়গাটা টনটন করে ওঠে। কোনো এক অজানা ব্যথায়—অনন্তবাবুর পিতৃস্নেহ কি তবে চারুর জন্য সুপ্ত ছিল!

আসলে অনন্তবাবুর ভাবনাকে মিথ্যে করে দিয়েছে মঙ্গলা বৌদি ও চারু। মঙ্গলাবৌদি তার কাছ থেকে সাহায্য আশা করেছিল ঠিকই—তবে সে সাহায্য ছিল একজন অভিভাবক হিসেবে, বাবার পরিবর্তে কাকাবাবু হিসেবে। চারুর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে অনন্তবাবুর ভুল ভাঙল। একজন অনাত্মিক তনয়ার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষিত এক স্নেহের কোমল স্পর্শে। সে যেন তার নিজের মেয়েকে খুঁজে পেল। জানলা ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে তার চোখে অঝোর শাওন বুঝি অনুতাপের! বাবার মত হয়েও এক পিতৃহীন কন্যাকে ভালো না বাসতে পারার বোধে অনন্তবাবু সত্যিই পিতা হয়ে উঠলেন।

'তিন অধ্যায়' গল্পে, মিউনিসিপ্যালিটিতে ত্রিশ টাকা বেতনের কর্মচারী অহিভূষণ চাটুয্যে, বিত্তবান বন্ধুবর্গের কাছ থেকে যেমন বিতাড়িত হয়েছিল তেমনি এই বিত্তবান বন্ধুদের (বিশেষত বারীন) কে মানিবকতার তুল্যমূল্যে দাঁড় করিয়ে সে অনেক বড় মাপের মামুষ হয়ে উঠেছিল। বারীনের মতো বন্ধুরা তার বিয়ে ভেঙেছিল, বন্দনার মতো মেয়েরও বিয়ে ভাঙতে তারা পিছপা ছিল না। আসলে তাদের মনটা ছিল এতোটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন যে তারা কারও ভালো সহ্য করতে পারত না। এক সময় অহিভূষণও বন্দনাকে নিয়ে দু একটা কু-মন্তব্য করেছিল আর এক্ষেত্রে বারীন ভাবতেই পারেনি যে দুটি নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়ে এক সাথে মিলে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটাতে পারে। সুবোধ ঘোষ আমাদের কাছে সেই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছেন যে মানুষের আলো-অন্ধকারে মেশানো মনোজগতে গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। সেখানে

অহিভূষণ দারিদ্র্যতা জয় করে সমাজে আলোর সামনে মুখ রেখেছিল, আর বারীন বিত্ত ও প্রাচুর্যের মধ্য থেকেও অন্ধকারের ঘরে পা বাড়াল আর সেই কারণে অহি আর বন্দনা যখন উভয় উভয়কে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন কেবলি বারীনদের বার বার মনে হয়েছে—'...তাহলে কী এ বিয়ে ভেঙে যাবে? এর আগে দু-দুবার তাদের আমরা ভেঙেছি। আমাদের নাগালের মধ্যে তারা এসেছিল, তাই। আজ কিন্তু ঘটনা সে নিয়মের মধ্যে নেই। তারা নিজের পৃথিবীতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে...।' বন্দনা সম্পর্কে যে অ্যানালিসিস 'জমকালো শাড়ি আর রিকসার পয়সা যে এমনিতেই হয় সে তত্ত্ব আমি বুঝি।' একদিন খারাপ অর্থেই ছিল। সেই বন্দনাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসে সামিয়ানার নীচে অহির পৃথিবীতে লাল চেলির শাড়িতে জড়ানো বন্দনার সলজ্জ মূর্তিটাকে দেখে তার মনে হল তার আগের অ্যানালিসিসটা ভুল ছিল। অনুতাপ ও পরাজয়ের গ্লানি বারীনের অন্তর্ভাবনা এক নতুন আলোর অ্যানালিসিসে ধরা পড়ল—'এই ধরনের মেয়েরা যারা চোখ তুলে তাকাতে পারত না, ইচ্ছে করেও হাসতে পারত না, তারা শুধু চায় যে....।' এভাবেই লেখক বারীন ও তার বন্ধুদের মনের অন্ধকার পথ থেকে চেতনার আলোকিত পথে নিয়ে আসলেন। আর বন্দনা ও অহিভূষণ তথাকথিত অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেল।

'অলীক' গল্পের আরম্ভে লম্বাটে ধরনের একজন চল্লিশ ঊর্ধ্ব মানুষের পরিচয় পাই যে তারিণী মিত্তির রোডে সবচেয়ে বড় লালরঙের বাড়িতে গগনবাবুর ছোট মেয়ের বিয়েতে আবির্ভূত হয়েছে। "গায়ের রঙ বেশ কালো হলেও সাজটা কিন্তু ধবধবে সাদা। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, ফরাসডাঙা ধুতি, পায়ে সাদা চামড়ার নাগরা। কোঁচাটা পাঞ্জাবির পকেটে গোঁজা, থরে থরে কুঁচি করা কোঁচার প্রান্তভাগ জাপানি পাখার মতো পকেটের ভেতর থেকে বাইরে উঁকি দিয়ে রয়েছে।" ...দত্তবাবুর সঙ্গে এতো মাখামাখি যখন করছে নিশ্চয় 'স্টুয়ার্ট অ্যান্ড মিলারের পারচেজিং ডিপার্মেন্টের সিনিয়ার গ্রেডেরই কেউ হবে'—এহেন ব্যক্তিকে সম্মান না করে পারা যায়? কিন্তু খাওয়ার শেষে স্যান্ডোর দল তাকে ধরে ফেলেছে। চড় থাপ্পড়ে সে যখন জর্জরিত তখন দত্তবাবু তার সামনে এসে বললেন—'ছি ছি ছি কি কুৎসিত ব্যাপার। ভদ্রলোককে তোমরা এরকম ... নেপাল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ভদ্রলোক নয় স্যার, এটা একটা অলীক।' এই লোকটি বিশ বছর ধরে জেল হাজত, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, চোরাকারবারি বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিল কিন্তু বর্তমানে বেছে বেছে বিয়েবাড়িতে বিনা নিমন্ত্রণে খেয়ে আসে। কিন্তু এই মানুষটি এমনকি তার বউ নাকছাবির কাছেও অচেনা, সেও জানেনা অলীকের আসল পরিচয়। নূটবিহারী থেকে হরিপদ, হরিপদ থেকে মহাদেববাবু, আর পুলিশের খাতায় অফুরন্ত নামের তালিকা। একের পর এক নাম বদল করতে করতে নিজের নামটাই সে হয়ত আজ ভুলে গিয়েছে। এভাবেই দিন চলে তার। সেবারের অঘ্রাণে চারটে বিয়ে বাড়ি ছিল। অলীক তার স্ত্রীর কাছে 'মিটিং-এ' যাবার নাম করে শেষ বিয়েবাড়িটাই দই-সন্দেশ খেয়ে পার করার কথা ভাবল। রাত দশটার লগ্নে সে একটা সাদামাটা বিয়েবাড়িতে ঢুকে পড়ল। বরপণের টাকা জোগাড় করতে না পারায় ছেলের বাবা বিয়ে দেবে না। কিন্তু অলীক এই মানুষটি হৃদয়বান কন্যাপক্ষ হয়ে ছেলের বাবাকে বিয়ে হয়ে যাবার পর দেড়শো

টাকা মিটিয়ে দেবে বলে কথা দেয়—কারণ তাকে সকলেই চেনে, সে হলো এ পাড়ার 'ছোটবাবু'। সে রাত্রে বিয়ে হয়ে গেল, একটি কচি মেয়ের, যার কপালে চন্দন আঁকা। দারিদ্র্যতার অনাহার ক্লিষ্ট সহায় সম্বলহীন দুটি নর-নারীর দাম্পত্য জীবনে অভাবের ছাপ, শীর্ণকায় স্ত্রী নাকছাবি তার অভাবী লাল পেড়ে শাড়ি ও টিকালো নাক নিয়ে কোনরকমে নাই নাই করে দিন চালিয়ে নেয়। অলীক জানে পরের দিন সকালে সেই কচি মেয়েটা শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু তাকে কি শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যাবে? বরপণের টাকা সে কিছুতেই দিতে পারবে না, ঘরে তার কিছুই সম্বল নেই, সঞ্চয়ও নাই কিছু তবুও পরমুহূর্তেই শঠ, কপট চতুর জীবনের সমস্ত রকমের দক্ষতা ও শক্তিকে মনে মনে আহ্বান জানিয়ে ঘরের বাইরে পা রাখল। একরকম দৌড়েই সে নাকছাবির হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল। আর যাবার সময় বলে গেল—"আজ একটা নতুন কাজে বেরুচ্ছি বউ, যদি রাত্রে না ফিরি, তবে সকাল বেলায় বেলগেছে থানায় কিংবা হাসপাতালে একবার খোঁজ করিস।" সে জানে ঐ বিয়েবাড়িতে গেলে তার রেহাই থাকবে না, যে যেমন পারবে, তেমন দেবে তবুও, সেইসব কল্পিত ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলি ভেবেও তাকে কেন জানিনা আজ কপালে চন্দন আঁকা কচি মেয়েটির সামনে উপস্থিত থাকতেই হবে। আজ তার বড্ড লোভ হচ্ছে চুপি চুপি 'মেয়ে বিদায়ের কান্না চুরি করতে'। পৃথিবীর সমস্ত মেয়েগুলোর বাবাদের বিষণ্ণ ও ব্যথাতুর জলভরা চোখের সামিল হতে। চন্দনের ফোঁটা আঁকা একটি কচি মেয়ের মিথ্যে বাবা হয়ে শখ করে চোখের জল ফেলতে। অঘ্রাণের গত সন্ধ্যাতেও যে মানুষটি চুরি করে বিয়েবাড়ির খাবার খেতেই আগ্রহী ছিল হঠাৎ করে একটি কচি মেয়ের কপালে চন্দন আঁকা সজল চোখের মায়াবী দৃষ্টিতে তার মনের লোভাতুর গন্ধ খুঁজে পেতে চাইছে। বাঁ দিকের ভ্রূর ওপর ক্ষতের দাগটা এখনও ব্যথায় টনটনে। রক্তমাখা সাদা মখমলের উড়ুনিটা অলীক কাঠের তক্তার উপর আছাড় দিয়ে কেচে চলেছে। বৌ কে পুজোর পসরা হাতে দেখে কৌতুহল বশতঃ জিজ্ঞেস করল—'কোথায় যাচ্ছিস বউ?" নাকছাবি জানাল গতকাল তার জন্য একটা মানত করেছিল—সেটাই দিতে যাচ্ছে আর কি—কাপড়কাচা থামিয়ে দিয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে অলীক বলল—'আর কোন মানত করবি না?' ক্ষণমুহূর্তে নাকছাবি তার অতীত হাতড়িয়ে কোনো পুরাতন মানতের কথা মনে করতে পারল না। আজ এত বছর পর এই সন্ন্যাসীর মতো মানুষটা এ কি কথা বলছে? তার জিজ্ঞাসু চোখে অলীক তার ব্যাকুল দৃষ্টি রেখে বললো—'তোর কোলে একটা আসুক ... কিনতু ঠিক করেছিস কিছু, কি চাইবি? ছেলে না মেয়ে?' মুহূর্তের মধ্যে নাকছাবির শীর্ণ ও সাদা ঠোঁট দুটো অদ্ভুত একটা হাসির স্পর্শে লাল হয়ে উঠল—'তুমি যা বলবে।' অলীক বলে ওঠে—'মেয়ে চাই।' অপত্য স্নেহের বাহুবন্ধনে একটি সন্তানকে কাছে পাওয়ার আকুলতা কিভাবে লেখক অলীকের মতো একটি ঠগ মানুষের অন্তরে জুড়ে দিলেন, আঁকলেন এক সর্বহারা মানুষের পিতা হবার স্বপ্নকে—তা সত্যই অনুপম। নির্মম সত্যের বাস্তবতার কাছে পরাজিত অসহায় বিত্তহীন মানুষের অন্তরেও ভালোবাসার কণা সুপ্ত থাকে; চেতনার আলো-বাতাসে কখনো কখনো সেই সূক্ষ্ম অনুভূতির পর্দাগুলো সরে যায়।

'ঠগিনী' গল্পে সনাতন সেন ও সুধা সেন—পিতা ও কন্যা। মানুষ ঠকিয়ে তারা

রোজগার করে পেট চালায়। ঠগকারবারিতে বাবা ও মেয়ের জুড়ি মেলা ভার। বিবাহ নামক খেলা খেলে নিখুঁত অভিনয় করে বার তিনেক স্বামী বদল করল সুধা আর জামাই বদল করল সনাতনবাবু। তারকেশ্বরে ব্রাহ্মণ পরিবার, ভাটপাড়ায় (নৈহাটী) এসে হল বৈদ্য। বারবার বাসা বদল, জাত বদল ও নামবদল। সুধা সেন রমেশ নামের একজন আর্টিস্টকে ভালোবেসে বিয়ে করল। স্বামীর সাথে নতুন বাসাবাড়িতে, নতুন সংসারে নববধূর ভূমিকাতে সুধা সেন করবী হল। কিন্তু আবার এখান থেকে পালাবার জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। নিজের হাতে রান্না করে রমেশের সাথে এক থালাতে খেতে খেতে করবী কেঁদে ফেলে—'আমি তোমাকে ঠকাতে এসেছি। আমি তোমার স্বজাত নই, আমি করবী নই, আমি কুমারী নই। আমি এক ভয়ঙ্কর বাপের ভয়ঙ্কর মেয়ে। পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দাও।' স্তম্ভিত রমেশ চিৎকার করে তখন বলে ওঠে—'তুমি কি ভয়ঙ্কর বাপের কাছেই ফিরে যেতে চাও?' নিরুত্তর সুধা চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে—'তুমি বলো, তুমি আমাকে যেতে দিতে চাওনা।' অশ্রুসজল চোখে রমেশ সুধার হাত ধরে বলে 'যেতে দিতে ইচ্ছে করে না।' গল্পের শেষে, লেখক এক পাঁকমাখা নারী হৃদয়ের আত্মশুদ্ধির কথা বললেন। এতদিন যে নারীর কাজ ছিল পুরুষ ঠকানো, আজ সেই নারী সত্যিই রমেশকে ভালোবেসে তার জীবনের সমস্ত অন্ধকারকে দূর করে দিতে কঠোর ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ঠগ পিতাকে ঠকিয়ে সে আজ সত্যিই নব চেতনার এক নতুন আলোর সন্ধান পেল। তাইতো শেষপর্যন্ত তার পিতার মুখ থেকেই এই প্রথমবার শুনতে আজ সত্যিই নব চেতনার এক নতুন আলোর সন্ধান পেল। তাইতো শেষপর্যন্ত তার পিতার মুখ থেকেই এই প্রথমবার শুনতে হল—"ইস; মেয়ে হয়ে বাপকে কী এমন করে ঠকাতে হয়রে ঠগিনী!"

'শুক্লাভিসার' গল্পে বিধবা বরুত্রী চাকুরী খুঁজতে এসে ত্রিপাঠির সাথে পরিচয় এবং হরিজন মেয়েদের স্কুলে তার চাকুরী পাওয়া। বরুত্রী মনে মনে ত্রিপাঠীকে ভালোবেসেছিল কিন্তু ত্রিপাঠীর দিক থেকে কোনো সাড়া আসেনি। তাই ত্রিপাঠীকে একটু তফাতে রেখে তার জীবনে এলোট স্টীভেডর মিত্র অ্যান্ড কোম্পানীর মালিক শ্রীকান্ত মিত্রের একমাত্র পুত্র পুস্কর মিত্র। পুস্করের উদ্দাম কলোচ্ছ্বাসকে সে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না, বরুত্রী সন্তান সম্ভবা হল। যে পুরুষ একদিন হরিজন মেয়েদের পড়ানো দেখে, তাদের জন্য কিছু কাজ করা—দেখে, যার মনে সাধ জেগেছিল যে, সেও একটা হরিজন স্কুল খুলবে 'একবেলা দুটো বাজরার রুটি চিবিয়ে দেশের গরীবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে থাকবে। আমি তোমারই মতো সেবার ব্রতে নেমে আসতে চাই।' আবার কখনও ভোর রাত্রে বরুত্রীর সাথে সন্তানসম্ভবা মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের রিপোর্ট নিতে বেরিয়ে পড়ে। এভাবে পুস্করের হরিজন সেবা ছিল একটা ভণ্ড তপস্যা। সে আসমানী ফৌজে চাকরী পেল, এবারে সে বরুত্রীকে 'নোংরা চাকরির দুঃখ' ভুলিয়ে দেবে বলে অনড় হয়ে থাকে—আলমোড়াতে একটা বাংলো ভাড়া করে বরুত্রীকে নিয়ে যাবে স্থির করে। কিন্তু বরুত্রী তার সন্তানকে মেনে নিয়েছে কিন্তুর তার প্রস্তাবকে মেনে নেয়নি। 'হরিঘোষের গোয়ালের একটা পশু'র মতো পুস্করের সন্তান মানুষ হবে না—পুস্করের এ কথায়ও বরুত্রী যেতে পারেনি সে স্কুল ও মেয়েদের ছেড়ে। তার কাছে "আমার জীবনের একটা তৃপ্তি আমি মিথ্যে করে দিতে পারি না। স্কুলের

মেয়েদের ছাড়া পৃথিবীর কোন আলমোড়ার বাংলো আমার ভালোলাগবে না।" পুস্করের চোখে লেগে থাকা আলোর রংটা ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। পুস্কর চলে যায় পিতৃত্বের দায়ভারকে অস্বীকার করে। এডভেঞ্চারার পুস্কর তার অন্তরের আলোটাকে নিভিয়ে দেয় কোন এক অজানা মধ্যবিত্ত আশঙ্কায়। এবারে দেখি ত্রিপাঠীর অন্য রূপ। এই কাজ পাগল লোকটি শুধু কাজের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল—কিন্তু এই মানুষটির মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল অন্য আর এক মন—ভালোবাসার—মহত্তের—ও প্রেমের। পুষ্করের সন্তান গর্ভে ধারণ করে কুমারী যখন নিঃস্ব হয়ে ত্রিপাঠীকে বলল—"আমার জীবনে দুর্নামের দাগ লেগেছে। স্কুলের সম্মান আগে বাঁচাতে হবে। ত্রিপাঠী—হ্যাঁ, বাঁচাতে হবে। আমি আর তুমি দুজনে মিলে বাঁচব। বরুত্রী—দুজনে মিলে?" ত্রিপাঠী বলল—"হ্যাঁ গো সাহেবা। আমি মহাপুরুষ নই। আমি কাজের মানুষ। দুজনে মিলে কাজ করতে জানি।" 'উতলা আকাঙ্ক্ষায়' বরুত্রীকে চকিতে বুকের উপর টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরল—এ কি করছ দেবল? ত্রিপাঠী—'তোমাদের দুজনকে চুমো খাচ্ছি'—বরুত্রীর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হল কথাগুলো—তাই আবারও জিজ্ঞেস করল—দুজনকে মানে?—'তোমাকে আর ... আমার ছেলেকে।' যে আত্মবিশ্বাস ও নির্ভরতায় 'দুটি পুরুষ বাহু' বরুত্রীর হাত ধরল সেই নির্ভরতার মধ্যেই জন্ম নেবে তাদের সন্তান।

এভাবেই আলো-আঁধারের সিঁড়ি ধাপে ধাপে পার হয়ে তাঁর গল্পে একাধিক কখনো কান্না দিয়ে, কখনো প্রতীক্ষা করে, কখনো বা ভালোবেসে আবার কখনো না পাওয়ার যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে একের পর এক গল্পের সারিতে ভিড় জমিয়েছে। রক্তমাংসের মানুষের ত্রুটি-দুর্বলতা-হীনতা-ত্যাগ-মহত্ব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য চরিত্রের এক বিন্দুতে আলো-আঁধারের চমকপ্রদ অথচ বিক্ষিপ্ত বিচ্ছুরণ পাঠককে বিহ্বল করে। তাই উদাহরণের সংখ্যা বা ব্যাখ্যা না বাড়িয়ে বলা যেতে পারে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা যেমন সত্য, তেমনি সত্য শ্রেণীদ্বন্দ্ব, তেমন সমান সত্য মানুষের ভালোবাসা এবং ভালোবাসাত্তর এক অদ্ভুত অনুভূতি। অনুভূতি নির্ভরতার বলিষ্ঠতার যা মানুষকে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের মোহনায় আলোকের ঝর্ণা ধারায়। সুবোধ ঘোষের গল্পে তাই শেষ কথা বলে কিছু নেই, আছে ভবিষ্যতের কথারম্ভ।

Barsha Biswas, Bnakura Christian College, Bnakura, West Bengal
anal.biswasl@gmail.com

বাণী বসুর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর অবস্থান

শ্রীতা মুখার্জী

আমার আলোচনার বিষয় হল বাণী বসুর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক এবং সেখানে নারীর অবস্থান। দাম্পত্য সম্পর্কে ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা দুজন মানুষের সহাবস্থান ঘটে। এমতাবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই আত্মসচেতন নারী-পুরুষের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মনোমালিন্য, বনিবনার অভাব দেখা যায়। এর সমাধান কি সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা, নাকি একপক্ষের নিরস্ত্রীকরণ নীতি অবলম্বন করে মেনে মানিয়ে চলা! ধৈর্য, স্থৈর্য্য, মনোযোগ দিলে চিড় খাওয়া সম্পর্ক কি জোড়া লাগতে পারে আবার! একবিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মনে জাগে প্রশ্ন। বাণী বসুর তিনটি উপন্যাস ও তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে দেখা যাক তিনি এ বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন। 'মৈত্রেয় জাতক', 'অষ্টম গর্ভ' ও 'গান্ধর্বী' উপন্যাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র যথাক্রমে বিশাখা, মনোমোহিনী এবং অপালা। দেখা যাক, এই তিন নারী কিভাবে জীবনকে দেখছে, সম্পর্ককে দেখছে।

পোশাক-আশাক, ভাষা, জীবনযাপন প্রণালী ও কালগত দিক থেকে এই তিন নারী একে অন্যের থেকে আলাদা। তবু কোথাও যেন তারা এক হয়ে গেছে। একই কথার প্রতিধ্বনি করেছে। একই ভাবের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। 'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসে গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতভূমির সামাজিক, রাজনৈতিক ধর্মীয় জীবন চিত্রিত হয়েছে। 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলার সামাজিক অস্থিরতা, আর্থিক সংকট, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত ও চারিত্রিক অবমূল্যায়নকে দেখানো হয়েছে। 'গান্ধর্বী' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজ পরিকাঠামোয় বড়ো হয়ে ওঠা এক নারীর সাধনা ও সংগ্রাম তার গান্ধর্বী প্রকৃতি ও মানবী হৃদয়বৃত্তির মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা হয়েছে। উপরোক্ত উপন্যাসগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য তিনটি নারী চরিত্রকে একই সারিতে রেখে দেখা যাক কিভাবে সমাজের ঈপ্সিত মূল্যবোধকে উপেক্ষা না করেও তারা গড়ে নিয়েছে নতুন মূল্যবোধ, রচনা করেছে নতুন পাণ্ডুলিপি।

'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিশাখা, সাকেতের শ্রেষ্ঠীকন্যা বিশাখা কোনো সামান্য কন্যা নয়, 'আচারিয় মহাকল্পক আসেন শাস্ত্র শিক্ষা দিতে। মা দেবী সুমনা স্বয়ং তাকে চিত্র লিখতে শিখিয়েছেন; শিখিয়েছেন কীভাবে শাখা-প্রশাখায় প্রলম্বিত বিশাল সংসার ধারণ করে রাখতে হয়। পিতা শেখান অর্থের গণনাকৌশল, প্রয়োগ, বাণিজ্য মন্ত্র।'[১] সহজাত মর্যাদাবোধসম্পন্না, বাক্‌পটু, বুদ্ধিমতী পঞ্চকল্যাণী বিশাখার রূপৈশ্বর্যের পরিচয় দেওয়া হয় এভাবে, 'বিশাখার গায়ের রঙ

মুখার্জী, শ্রীতা : বাণী বসুর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর অবস্থান
International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 141-146